শারহুল আক্বীদা আত্-ত্বহাবীয়া

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ১. তাওহীদের সংজ্ঞা ও তার প্রকারভেদ

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইমাম ইবনে আবীল ইয আল-হানাফী (রহিমাহুল্লাহ)

রসূলগণ যে তাওহীদের প্রতি আহবান করেছেন, তার প্রকারভেদ -১

রসূলগণ যে তাওহীদের প্রতি তাদের উম্মতদেরকে আহবান জানিয়েছেন এবং আল্লাহর কিতাবসমূহে যে তাওহীদের বর্ণনা রয়েছে তা দু‘প্রকার।

(১) আল্লাহর পরিচয় ও তার সিফাত সম্পর্কিত তাওহীদ এবং

(২) আবেদন-নিবেদন, উদ্দেশ্য ও নিয়ত সম্পর্কিত তাওহীদ।[1]

প্রথম প্রকার হলো, মহান প্রভুর সত্তার বাস্তবতা, তার গুণাবলী, কার্যাবলী এবং তার নামসমূহ সাব্যস্ত করা। উপরোক্ত বিষয়াবলীর কোনটিতেই তার সদৃশ নেই। যেমন আল্লাহ তা‘আলা তার নিজের সম্পর্কে এ খবর দিয়েছেন এবং তার রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও অনুরূপ সংবাদ দিয়েছেন। কুরআন অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে এ প্রকার তাওহীদ সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছে।

সূরা হাদীদের প্রথম দিকে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾

‘‘আসমান ও যমীনসমূহের প্রতিটি জিনিসই আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করেছে। তিনি মহা পরাক্রমশালী ও অতিশয় বিজ্ঞ। পৃথিবী ও আকাশ সাম্রাজ্যের সার্বভৌম মালিক তিনিই। তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। তিনিই প্রথম তিনিই শেষ, তিনিই প্রকাশিত, তিনিই অপ্রকাশ্য[2] এবং তিনিই সব বিষয়ে অবহিত। তিনিই আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন এবং তারপর আরশে সমুন্নত হয়েছেন। যা কিছু মাটির মধ্যে প্রবেশ করে, যা কিছু তা থেকে বেরিয়ে আসে এবং যা কিছু আসমান থেকে অবতীর্ণ হয় আর যা কিছু আসমানে উঠে তা তিনি জানেন। তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সাথে আছেন। তোমরা যা করছো আল্লাহ তা দেখছেন। আসমান ও যমীনের নিরংকুশ সার্বভৌম মালিকানা একমাত্র তারই। সব ব্যাপারের ফায়সালার জন্য তার কাছেই ফিরে যেতে হয়। তিনিই রাতকে দিনের মধ্যে এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবিষ্ট করেন। তিনি অন্তরের গোপন বিষয় সম্পর্কেও অবহিত’’।

সূরা ত্বহার প্রথম দিকে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿تَنزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾

‘‘যেই সত্তা পৃথিবী ও সুউচ্চ আকাশমন্ডলী সৃষ্টি করেছেন তার পক্ষ থেকে এটি নাযিল করা হয়েছে। পরম দয়াবান আল্লাহ আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন। পৃথিবী ও আকাশে যা কিছু আছে, পৃথিবী ও আকাশের মাঝখানে যা আছে এবং যা কিছু ভূগর্ভে আছে, সবকিছুর মালিক তিনিই। তুমি যদি নিজের কথা উচ্চকণ্ঠে বলো, তবে তিনি তো চুপিসারে বলা কথা বরং তার চেয়েও গোপনে বলা কথাও জানেন। তিনি আল্লাহ, তিনি ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ নেই, তার জন্য রয়েছে সর্বোত্তম নামসমূহ’’। (সূরা ত্বহা: ৩-৮) সূরা হাশরের শেষাংশে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

‘‘তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত আর কোনো সত্য মাবুদ নেই। তিনি عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ (অদৃশ্য ও প্রকাশ্য সবকিছু সম্পর্কে অবগত), তিনি رحْمَنُ (পরম করুনাময়) এবং رَحِيمُ (অসীম দয়ালু)। তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত অন্য কোনো সত্য মাবুদ নেই। তিনি مَلِك (মালিক), قُدُّوس (অতি পবিত্র) سَلَام (শান্তিদাতা), مؤْمِن (নিরাপত্তা দানকারী), مُهَيْمن (রক্ষাকারী), عَزِيز (পরাক্রমশালী), جَبَّار (প্রতাপশালী), مُتَكَبِّر (মহিমান্বিত)। তারা যাকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করে আল্লাহ তা‘আলা তা থেকে পবিত্র। তিনিই আল্লাহ, خَالِق (সৃষ্টিকারী), بَارِي (উদ্ভাবক) এবং مُصَوِّر (রূপদাতা), তার জন্য রয়েছে অনেক সুন্দরতম নাম। আর তিনিই عَزِيز (মহাপরাক্রমশালী) ও حَكِيم(প্রজ্ঞাবান)’’।

আল্লাহ তা‘আলা সূরা সেজদার প্রথম দিকে বলেন,

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ (4) يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (5) ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (6) الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ (7) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (8) ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ﴾

‘‘আল্লাহই আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী এবং এদের মাঝখানে যা কিছু আছে সব সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। অতঃপর আরশে সমুন্নত হয়েছেন। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো সাহায্যকারী নেই এবং নেই তার সামনে সুপারিশকারী। তারপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত দুনিয়ার যাবতীয় বিষয় পরিচালনা করেন এবং এ পরিচালনার বৃত্তান্ত উপরে তার কাছে যায় এমন একদিনে যার পরিমাপ তোমাদের গণনায় এক হাজার বছর। তিনিই প্রত্যেকটি অদৃশ্য ও দৃশ্যমান বস্তু সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। তিনি মহাপরাক্রমশালী ও দয়াময়। যিনি সৃষ্টি করেছেন উত্তম রূপে এবং তিনি মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন কাদামাটি থেকে, তারপর তার বংশধর সৃষ্টি করেছেন তুচ্ছ পানির সংমিশ্রণ থেকে। তারপর তাকে সুঠাম সুন্দর করেছেন এবং তার মধ্যে নিজের রূহ ফুঁকে দিয়েছেন আর তোমাদের কান, চোখ ও হৃদয় স্থাপন করে দিয়েছেন। তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো’’। (সূরা হা-মীম আস-সাজদাহ:৪-৯)

সূরা আল-ইমরানের শুরুর দিকে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾

‘‘আল্লাহ একক সত্তা, তিনি ছাড়া অন্য কোনো সত্য ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব এবং সৃষ্টিজগতের সবকিছুর ব্যবস্থাপক ও ধারক’’। (সূরা আলে-ইমরান: ১)

আল্লাহ তা‘আলা একই সূরায় আরো বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

‘‘পৃথিবী ও আকাশের কোনো কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন নেই। তিনি মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন। এ প্রবল পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানের অধিকারী সত্তা ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ নেই’’। (সূরা আলে ইমরান: ৫-৬)

সূরা ইখলাসের পুরোটাই আল্লাহর পরিচয় ও গুণাবলী বর্ণনা করছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾

‘‘হে নাবী তুমি বলো, তিনি আল্লাহ্ একক। আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি, কারো থেকে জন্ম নেননি এবং তার সমতুল্য কেউ নেই’’।

এমনি আরো বহু আয়াতে এ প্রকার তাওহীদের ব্বিরণ এসেছে।[3]

আর কুরআন মাজীদের সূরা কাফিরূনে দ্বিতীয় প্রকার তাওহীদ তথা বান্দার আবেদন-নিবেদন, উদ্দেশ্য ও নিয়ত সম্পর্কিত তাওহীদের ব্বিরণ এসেছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (2) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (3) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (4) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (5) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾

‘‘হে নাবী বলো, হে কাফেররা! আমি তাদের ইবাদত করি না যাদের ইবাদত তোমরা করো। আর না তোমরা তার ইবাদত করো, যার ইবাদত আমি করি। আর না আমি তাদের ইবাদত করবো, যাদের ইবাদত তোমরা করে আসছো। আর না তোমরা তার ইবাদত করবে, যার ইবাদত আমি করি তোমাদের দীন তোমাদের জন্য এবং আমার দ্বীন আমার জন্য’’।

আল্লাহ্ তা‘আলা সূরা আলে ইমরানের ৬৪ নং আয়াতে বলেন,

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾

‘‘হে নাবী বলো, হে আহলে-কিতাবগণ! এসো এমন একটি কথার দিকে, যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান। তা এ যে, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবো না, তার সাথে কাউকে শরীক করবো না এবং আমাদের কেউ একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে নিজের রব হিসাবে গ্রহণ করবে না। তারপরও যদি তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, তাহলে বলে দাও যে, সাক্ষী থাকো আমরা অবশ্যই মুসলিম’’।

সূরা যুমারের প্রথম দিকে ও শেষ দিকে তাওহীদুল উলুহীয়াহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾

‘‘অতএব, তুমি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর ইবাদত করো। জেনে রাখো! নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত কেবল আল্লাহর জন্যই। যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে মাবুদরূপে গ্রহণ করেছে এবং বলে যে, আমরা তাদের ইবাদত এ জন্যই করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের মধ্যে তাদের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ের ফায়ছালা করে দেবেন। আল্লাহ্ মিথ্যাবাদী কাফেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না’’। (সূরা যুমার: ২-৩) একই সূরার শেষের দিকে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنْ الشَّاكِرِينَ﴾

‘‘তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে, যদি আল্লাহর শরীক স্থির করো, তবে তোমার কর্ম নিস্ফল হবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। বরং আল্লাহর ইবাদত করো এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত থাকো’’। (সূরা যুমার: ৬৫-৬৬)

সূরা ইউনুসের প্রথম দিকে, মাঝামাঝি এবং শেষের দিকেও একই বিষয়ের আলোচনা এসেছে। আল্লাহ তা‘আলা সূরা ইউনূসের ৩ নং আয়াতে বলেন,

﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾

‘‘তিনি সকল কার্য পরিচালনা করেন। তার অনুমতি ব্যতীত কেউ সুপারিশ করতে পারবে না। তিনিই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতিপালক। অতএব তোমরা তারই ইবাদত করো। তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না?’’ আল্লাহ তা‘আলা এ সূরার শেষের দিকে বলেন,

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾

‘‘হে নাবী! বলো, হে লোকেরা! তোমরা যদি আমার দ্বীনের ব্যাপারে কোনো সন্দেহের মধ্যে থাকো তাহলে শুনে রাখো, তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত করো আমি তাদের ইবাদত করি না। বরং আমি কেবল সেই আল্লাহর ইবাদত করি, যার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে তোমাদের মৃত্যু। আমাকে মুমিনদের অন্তরর্ভুক্ত হবার জন্য হুকুম দেয়া হয়েছে। আর আমাকে বলা হয়েছে, তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে সঠিকভাবে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখো এবং কখনো মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কোনো সত্তাকে ডেকো না, যে তোমার না কোনো উপকার করতে পারে, না পারে ক্ষতি করতে। যদি তুমি এএটি করো তাহলে যালেমদের দলভুক্ত হবে’’।

সূরা আরাফের শুরুতে বলেন,

﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾

‘‘হে লোক সকল! তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের উপর যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তার অনুসরণ করো এবং নিজেদের রবকে বাদ দিয়ে অন্যান্য অভিভাবকদের অনুসরণ করো না। কিন্তু তোমরা খুব কমই উপদেশ মেনে থাকো’’। (সূরা আল আরাফ: ২) একই সূরার শেষের দিকে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾

‘‘তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাকো তারা তো তোমাদের মতই বান্দা। তোমরা তাদেরকে ডাকতে থাকো। তাদের সম্পর্কে তোমাদের ধারণা যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে তারা তোমাদের আহবানে সাড়া দিক’’। (সূরা আল ‘আরাফ: ১৯৪) আল্লাহ তা‘আলা একই সূরার সর্বশেষ আয়াতে বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾

‘‘তোমার রবের সান্নিধ্যে অবস্থানকারী ফেরেশতাগণ কখনো নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে তার ইবাদতে বিরত হয় না, বরং তারা তারই মহিমা ঘোষণা করে এবং তার সামনে সিজদাবনত হয়’’।

সূরা আন‘আমের সর্বত্রই তাওহীদুল উলুহীয়ার বিশদ ব্বিরণ রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

‘‘আমি একনিষ্ঠ হয়ে স্বীয় চেহারা ঐ সত্তার দিকে ফিরাচ্ছি, যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অমর্ন্তভুক্ত নই’’ (সূরা আল আন‘আম: ৭৯)।

মোটকথা কুরআনের অধিকাংশ সূরাতেই উপরোক্ত দু’প্রকার তাওহীদের আলোচনা রয়েছে। বরং প্রত্যেক সূরাতেই রয়েছে তাওহীদের আলোচনা। কেননা কুরআনে যা রয়েছে, তা হয়ত আল্লাহ এবং তার অতি সুন্দর নাম ও সুমহান গুণাবলী সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছে, আর এটি হলো আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কিত তাওহীদ। অথবা তাতে রয়েছে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহবান, তার কোনো শরীক নেই এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য যেসব জিনিসের ইবাদত করা হয়, তা বর্জনের আদেশ। আর এটি হলো আল্লাহর নিকট প্রার্থনা, চাওয়া ও আবেদন-নিবেদন সংক্রান্ত তাওহীদ।

অথবা কুরআনে রয়েছে আল্লাহর আদেশ, নিষেধ এবং তার আনুগত্য করার বাধ্যবাধকতা। আর এগুলো হলো তাওহীদের হক ও পরিপূরক বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত। অথবা তাতে রয়েছে তাওহীদপন্থীদেরকে আল্লাহর পক্ষ হতে সম্মানিত করা, দুনিয়াতে তাদেরকে প্রতিষ্ঠা দান করা এবং আখেরাতে তিনি তাদেরকে যা দিয়ে সম্মান করবেন তদসংক্রান্ত বিষয়াদি। আর এটি হলো তাওহীদ বাস্তবায়নের বিনিময় স্বরূপ।

অথবা কুরআনে রয়েছে মুশরিকদের খবরাদি এবং দুনিয়াতে আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক কী পরিমাণ শাস্তি দিয়েছিলেন এবং আখেরাতে তাদের জন্য কী ধরণের আযাব অপেক্ষা করছে, তার বর্ণনা। আর এটি হলো ঐসব লোকের পরিণাম, যারা তাওহীদের বিধান ও হুকুম বর্জন করেছিল।

সুতরাং সম্পূর্ণ কুরআনই তাওহীদ এবং তার হকসমূহ বাস্তবায়ন করার সুফল সম্পর্কে বিশদ বর্ণনায় ভরপুর। একই সঙ্গে তাতে রয়েছে শির্ক এবং শির্ককারীদের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কিত আলোচনা। আমরা যদি সূরা ফাতিহার দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাই,

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

‘‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা’’। এতে রয়েছে তাওহীদ।

﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

‘‘তিনি অতি মেহেরবান ও পরম দয়ালু’’। এতেও রয়েছে তাওহীদ।

﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾

‘‘তিনি প্রতিদান দিবসের মালিক’’। এতেও রয়েছে তাওহীদ।

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾

‘‘আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি ও শুধু তোমার কাছেই সাহায্য চাই’’। এতেও রয়েছে তাওহীদ।

﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾

‘‘আমাদেরকে সরল সঠিক পথ দেখাও’’। এটি হলো সেই তাওহীদ, যাতে আল্লাহ তা‘আলার তাওহীদপন্থীদের পথের সন্ধান চাওয়া হয়েছে।

﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾

‘‘সে সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ’’। এখানে তাওহীদ বাস্তবায়নকারীদের অবস্থার বিবরণ রয়েছে।

﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾

‘‘তাদের পথ নয়, যাদের উপর তোমার গযব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে’’। এখানে রয়েছে, তাওহীদ বর্জনকারীদের পরিণামের বর্ণনা।

এমনি আল্লাহ তা‘আলা তার নিজের সত্তার জন্য তাওহীদের সাক্ষ্য দিয়েছেন, তার ফেরেশতারাও তাওহীদের সাক্ষ্য দিয়েছেন, তার নাবী-রসূলগণও একই সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّهِ الإِسْلاَمُ﴾

‘‘আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোনো সত্য মাবুদ নেই। ফেরেশতাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ্ নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহর নিকট ইসলাম হচ্ছে একমাত্র মনোনীত দ্বীন’’। (সূরা আলে-ইমরান: ১৮-১৯)

উপরোক্ত আয়াতটি তাওহীদের প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনা করেছে এবং তাওহীদ সম্পর্কে সমস্ত গোমরাহ সম্প্রদায়ের প্রতিবাদ করেছে। সর্বাধিক মহান সাক্ষ্যদাতা সর্ববৃহৎ বিষয়ের সাক্ষ্য দিয়েছেন। সুতরাং এটি সুমহান, সর্ববৃহৎ, সর্বাধিক ন্যায়নিষ্ঠ এবং সর্বাধিক সত্য সাক্ষ্য।

সালাফগণ شهد শব্দের যেসব অর্থ বর্ণনা করেছেন তা হলো, হুকুম করেছেন, ফায়ছালা করেছেন, জানিয়ে দিয়েছেন, বর্ণনা করেছেন এবং সংবাদ দিয়েছেন। شهد শব্দটি ঘুরেফিরে এ কয়টি অর্থই প্রদান করে। সবগুলো অর্থই সঠিক। তার মধ্যে কোনো পারস্পরিক বৈপরিত্য নেই। কেননা شهادة শব্দটি সাক্ষ্যদানকারীর বক্তব্য ও তার

খবরকে শামিল করে। সেই সাথে জানিয়ে দেয়া, সংবাদ দেয়া এবং বর্ণনা করাও এর অন্তর্ভুক্ত।

সাক্ষ্য দেয়ার চারটি স্তর রয়েছে।

(১) যে বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়া হবে, সে সম্পর্কে জানা আবশ্যক এবং তার বিশুদ্ধতা ও সত্যতা সম্পর্কে সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকা জরুরী।

(২) জবানের দ্বারা তা উচ্চারণ করা। যদিও উচ্চারণের মাধ্যমে কাউকে তার বিষয় সম্পর্কে জানানো সম্ভব না হয়। বরং সাক্ষ্যের বিষয়ে নিজের নফ্সের সাথে কথা বলা, তা স্মরণ করা, উচ্চারণ করা অথবা লিখে রাখাই যথেষ্ট।

(৩) সাক্ষ্যের বিষয় সম্পর্কে অন্যকে জানিয়ে দেয়া, তা সম্পর্কে সংবাদ দেয়া এবং খোলাখুলি রূপে তার ব্বিরণ দেয়া।

(৪) এর বিষয় বস্তু অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়া এবং তার আদেশ প্রদান করা।

সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা তার নিজের একত্বের সাক্ষ্য দেয়া এবং ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করা এ চারটি স্তরকেই শামিল করে। আল্লাহ সুবহানাহু তার একত্বের যেই সাক্ষ্য দিয়েছেন, সে সম্পর্কে তিনি পূর্ণ অবগত রয়েছেন, তিনি তা দ্বারা কথা বলেছেন, তার সৃষ্টিকে তা জানিয়ে দিয়েছেন ও তার সংবাদ প্রদান করেছেন এবং তা বাস্তবায়নের আদেশ দিয়েছেন ও তার বিষয় বস্তু কার্যকর করার দায়িত্ব সৃষ্টির উপর চাপিয়ে দিয়েছেন।

সাক্ষ্যের বিষয় সম্পর্কে ইলম থাকা জরুরী। অন্যথায় সাক্ষ্যদাতা এমন বিষয়ের সাক্ষ্য দিবে, যে সম্পর্কে তার কোনো জ্ঞান নেই। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُم يَعْلَمُوْنَ﴾

‘‘তবে যারা অবগত হয়ে সত্য স্বীকার করে’’। (সূরা যখরুফ: ৮৬)

রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্যের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন,

«عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ» ‘‘এরূপ সুস্পষ্ট বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করবে’’।

জবান দ্বারা সাক্ষ্যবাণী উচ্চারণ করা এবং তার সংবাদ প্রদান করা সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ﴾

‘‘তারা দয়াবান আল্লাহর বান্দা ফেরেশতাদেরকে নারী গণ্য করেছে। তাদের সৃষ্টির সময় কি এরা উপস্থিত ছিল? এদের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা হবে এবং এদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে’’ (সূরা যুখরুফ: ১৯)।

আল্লাহ তা‘আলা এখানে তাদের কথাকে সাক্ষ্য হিসাবে নাম দিয়েছেন। যদিও তারা শাহাদাত বা সাক্ষ্য দেয়া শব্দটি উচ্চারণ করেনি এবং অন্যদের নিকট সাক্ষ্য প্রদান করেনি।

সাক্ষ্য প্রদানের তৃতীয় স্তর অর্থাৎ সাক্ষ্যের বিষয় জানিয়ে দেয়া এবং সে ব্যাপারে সংবাদ দেয়া দু‘ প্রকার:

(১) কথার মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া।

(২) কর্মের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া।

আদেশের মাধ্যমে যে ব্যক্তি অন্যকে শিক্ষা দেয়, তার অবস্থা ঠিক এরকম। কখনো কথার মাধ্যমে শিক্ষা দেয় আবার কখনো কাজ-কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়। এ জন্যই যে ব্যক্তি তার ঘরকে মসজিদে রূপান্তরিত করে, তার ঘরের দরজা প্রশস্ত করে এবং মানুষকে সেখানে প্রবেশ করে ছালাত পড়ার অনুমতি দেয় সে মুখ দিয়ে কথা না বললেও তাকে এ ঘোষণাকারী হিসাবে ধরা হবে যে, সে তা মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছে। অনুরূপ যাকে দেখা যাবে সে কারো সান্নিধ্যে পৌঁছার জন্য নানা পথ অবলম্বন করছে, তার ব্যাপারে সে মূলতঃ নিজের জন্য এবং অন্যদের জন্য ঘোষণা করছে যে, সে তাকে ভালোবাসে। যদিও সে জবান দিয়ে তা উচ্চারণ না করে। এমনি জবান দিয়ে উচ্চারণ করলেও বুঝা যাবে যে, সে তাকে ভালবাসার ঘোষণা দিচ্ছে।

এমনি আল্লাহ তা‘আলার একত্বতা সম্পর্কে তার নিজের সাক্ষ্য দেয়ার অর্থ হলো তা বর্ণনা করা ও জানিয়ে দেয়া। এটি কথার মাধ্যমে হতে পারে আবার কাজের মাধ্যমেও হতে পারে। তিনি রসূলদেরকে যা দিয়ে পাঠিয়েছেন এবং যা দিয়ে তার আসমানী কিতাবসমূহ নাযিল করেছেন, তা কথার অন্তর্ভুক্ত।

কাজ-কর্মের মাধ্যমে তার একত্বতা সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া ও বর্ণনা করার উদাহরণ যেমন ইবনে কাইসান বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলা তার বিস্ময়কর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এবং তার অপরিবর্তনীয় আদেশসমূহের দ্বারা সৃষ্টির নিকট সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত আর কোনো সত্য ইলাহ নেই। অন্য একজন বলেছেন,

وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ... تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِد

‘‘প্রত্যেক জিনিসের মধ্যে তার নিদর্শন রয়েছে, যা প্রমাণ করে তিনি এক’’। কাজ-কর্মের মাধ্যমেও সাক্ষ্য দেয়া যায়। তার প্রমাণ হলো আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِۚأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ﴾

‘‘মুশরিকরা যখন নিজেরাই নিজেদের কুফরীর সাক্ষ্য দিচ্ছে তখন আল্লাহর মসজিদসমূহের রক্ষণা-বেক্ষণকারী ও খাদেম হওয়া তাদের কাজ নয়। তাদের সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে গেছে এবং তাদেরকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে’’ (সূরা আত তাওবা: ১৭)।

সুতরাং তারা তাদের কাজের মাধ্যমে তাদের নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে। মোট কথা আল্লাহ তা‘আলা তার নিদর্শনগুলোকে তার একত্বের দলীল হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা এগুলোকে সৃষ্টি করা ও নির্ধারণ করার দ্বারাই একত্বের দলীল বানিয়েছেন।

আর সাক্ষ্য দেয়ার চতুর্থ স্তর হলো এর বিষয়বস্তু কার্যকর করার আদেশ দেয়া এবং এতে বাধ্য করা। শুধু মুখ দিয়ে সাক্ষ্য উচ্চারণ করা এর বিষয়বস্তু বাস্তবায়ন করাকে আবশ্যক করে না। কিন্তু এখানে আল্লাহ তা‘আলা যে সাক্ষ্য দিয়েছেন, তার বিষয়বস্তু বাস্তবায়ন করার প্রতি নির্দেশনা প্রদান করে। কেননা আল্লাহ তা‘আলা এখানে যে সাক্ষ্য দিয়েছেন, তা হুকুমকারীর সাক্ষ্যও হুকুমের মতই। সুতরাং আল্লাহ তা‘আলা তাওহীদের ফায়ছালা করেছেন, তার হুকুম করেছেন এবং বান্দাদের উপর তা বাস্তবায়ন করা আবশ্যক করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾

‘‘তোমার রব এ ফায়ছালা দিয়েছেন যে, তাকে ছাড়া তোমরা অন্য কারো ইবাদত করো না। আর মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করো’’ (সূরা বনী ইসরাঈল: ২৩)। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ﴾

‘‘আল্লাহর ফরমান হলো, দু’ইলাহ গ্রহণ করো না, ইলাহ তো মাত্র এক, কাজেই তোমরা আমাকেই ভয় করো’’ (সূরা আন নাহাল: ৫১)। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾

‘‘তাদেরকে এ ছাড়া অন্য কোনো নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, ছলাত কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। এটাই সঠিক দ্বীন’’ (সূরা আল বায়্যিনাহ: ৫)। আল্লাহ্ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَـهاً وَاحِداً لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

‘‘তারা আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের পন্ডিত ও সংসারত্যাগী-বৈরাগীদিগকে তাদের প্রভু রূপে গ্রহণ করেছে এবং মারইয়ামের পুত্রকেও। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল একমাত্র মাবুদের ইবাদতের জন্য। তিনি ছাড়া অন্য কোন সত্য মাবুদ নেই, তারা তার যেসব শরীক সাব্যস্ত করে, তা থেকে তিনি পূত-পবিত্র’’ (সূরা আত তাওবা: ৩১)।

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿لَّا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا﴾

‘‘আল্লাহর সাথে দ্বিতীয় কাউকে মাবুদে পরিণত করো না। অন্যথায় নিন্দিত ও অসহায় পথহারা হয়ে পড়বে’’ (সূরা বনী ইসরাঈল: ২২)। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

‘‘আল্লাহর সাথে অন্য মাবুদদেরকে ডেকো না। তিনি ছাড়া আর কোনো সত্য মাবুদ নেই। সব জিনিসই ধ্বংস হবে কেবলমাত্র তার সত্ত্বা ছাড়া। হুকুম করার অধিকার একমাত্র তারই এবং তারই দিকে তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে’’ (সূরা কাসাস: ৮৮)।

কুরআনের প্রত্যেক স্থানেই তাওহীদের সাক্ষ্য বিদ্যমান। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার সাক্ষ্যের মাধ্যমে তাওহীদ বাস্তবায়ন আবশ্যক হওয়ার কারণ হলো, তিনি যখন এ সাক্ষ্য দিয়েছেন, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো সত্য ইলাহ নেই, তখন তিনি এ খবর, বর্ণনা, ঘোষণা, হুকুম ও ফায়ছালা দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া অন্য কেউ ইলাহ নেই অথবা তিনি ছাড়া অন্যদের ইবাদত বাতিল।

সুতরাং তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইবাদতের হকদার নয় এবং তিনি ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্যও নয়। তাই একমাত্র তাকেই ইলাহ হিসাবে গ্রহণ করার আদেশ দেয়া হয়েছে এবং তার সাথে অন্য কাউকে ইলাহ হিসাবে গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। لاإله إلا الله এর মধ্যে যে নফী (নেতীবাচক) ও ইছবাত (সাব্যস্ত করা) রয়েছে, তা থেকে সম্বোধিত ব্যক্তি সহজেই উপরোক্ত অর্থ বুঝতে সক্ষম। আপনি যখন কোনো লোককে দেখবেন, সে এমন একজন লোকের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করছে কিংবা সাক্ষ্য তলব করছে অথবা চিকিৎসা করতে বলছে, যে উক্ত কাজগুলোতে পারদর্শী নয় তখন আপনি জিজ্ঞাসাকারীকে সতর্ক করতে গিয়ে অবশ্যই বলবেন যে, এ লোক মুফতী নয়, অমুক ব্যক্তি সাক্ষ্য দানে পারদর্শী নয় এবং অমুক ব্যক্তি ডাক্তার নয়। অতএব এ থেকে বুঝা

যায় যে, আপনার পক্ষ হতে এটি আদেশ এবং নিষেধ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

সুতরাং ‘আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোনো সত্য উপাস্য নেই, সূরা আলে ইমরানের এ আয়াতটি প্রমাণ করছে যে, বান্দার ইবাদতের হকদার একমাত্র আল্লাহ। যখন তিনি সংবাদ দিয়েছেন, তিনিই একমাত্র ইবাদতের হকদার, তখন এ সংবাদ ইবাদতের আদেশ করা এবং বান্দার উপর আল্লাহর যেই হক রয়েছে তা আদায় করা আবশ্যক। বান্দাদের উপর আল্লাহর একক অধিকার হলো, তারা কেবল তারই ইবাদত করবে।

حكم এবং قضاء শব্দদ্বয় সংবাদ ও খবর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। নিছক সংবাদকেও বিচার এবং হুকুম বলা হয়। বলা হয়ে থাকে, মোকাদ্দমাটিতে এ রকম ফায়ছালা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾

‘‘শুনে রাখো, আসলে তারা তো মনগড়া কথা বলে। তারা বলে, আল্লাহর সন্তান রয়েছে এবং যথার্থই তারা মিথ্যাবাদী। আল্লাহ কি নিজের জন্য পুত্রের পরিবর্তে কন্যা পছন্দ করেছেন? তোমাদের কী হলো, কিভাবে এ ফায়সালা করছো?’’ (সূরা সাফফাত: ১৫১-১৫৪)

এখানে আল্লাহ তা‘আলা কাফেরদের নিছক সংবাদকে ফায়ছালা হিসাবে নাম দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾

‘আমি কি অনুগতদের অবস্থা অপরাধীদের মতো করবো? কী হয়েছে তোমাদের? এ কেমন বিচার তোমরা করছো?’’ (সূরা কালাম: ৩৫-৩৬) তবে এখানে কাফের পক্ষ হতে যেই সংবাদ দেয়া হয়েছে তাতে কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

ফুটনোট

[1]. বান্দা যেসব আমলের মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ কামনা করে কিংবা অকল্যাণ প্রতিহত করার আশা করে যেমন দু’আ করা, ছলাত আদায় করা, সাহায্য চাওয়া, আশ্রয়প্রার্থনা করা, কোরবানী করা, মানত করা ইত্যাদিকে তাওহীদুদ তালাব ওয়াল কাসাদ বলা হয়। অনেক আলেম এটিকে তাওহীদুল উলুহীয়াহ হিসাবেও নাম রেখেছেন। তাদের অনেকেই আবার তাওহীদকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন।

(১) তাওহীদুর রুবুবীয়াহ,

(২) তাওহীদুল আসমা ওয়াস্ সিফাত এবং

(৩) তাওহীদুল উলুহীয়াহ।

শাইখ ইবনে আবীল প্রথম দু’টিকে আল্লাহ তাআলার কর্ম ও গুণাবলী সংক্রান্ত তাওহীদকে একই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, তাওহীদের এ প্রকারভেদ কুরআন-হাদীছের কোন

প্রকাশ্য দলীল থেকে গ্রহণ করা হয়নি; বরং কুরআন ও হাদীছের সমস্ত বক্তব্য থেকেই তাওহীদের এ প্রকারভেদের ধারণা এসেছে। বিদআতীদের অনেকেই বলে থাকে, ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ সর্বপ্রথম তাওহীদকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। তাদের এ কথা ঠিক নয়; বরং আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস, কাতাদাহ, মুজাহিদ, ইবনে বাত্তা, ইবনে মান্দাসহ আরো অনেক সালাফ থেকেই তাওহীদকে একাধিক শ্রেণীতে বিভক্ত করার প্রমাণ পাওয়া যায়। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া এবং ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ পূর্ববর্তী আলেমদের কথাকে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করেছেন মাত্র। (আল্লাহই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন)

[2]. আলেমগণ ও কালাম শাস্ত্রবিদগণ আল্লাহ তাআলার এ নামগুলোর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন। ছহীহ মুসলিমে বর্ণিত উপরোক্ত ছহীহ হাদীছে রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যেহেতু এগুলোর ব্যাখ্যা এসেছে, তাই এসব ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন ছিল না। আল্লাহ তা‘আলার এ চারটি নাম তথা الأَوَّل (সর্বপ্রথম) ও الآخر (সর্বশেষ) এবং الظَاهِر (সব কিছুর উপরে) ও البَاطِن (অতি নিকটে) প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা‘আলা সমস্ত সৃষ্টিকেই সকল দিক থেকে পরিবেষ্টন করে আছেন। الأَوَّل (সর্বপ্রথম) ও الآخر (সর্বশেষ) -এই দু’টি নাম প্রমাণ করে যে, তিনি সমস্ত কাল ও যামানাকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। অর্থাৎ স্থান, কাল এবং তাতে যত মাখলুক সৃষ্টি করা হয়েছে, তা সৃষ্টি করার পূর্বেও তিনি ছিলেন। স্থান, কাল ও সমস্ত মাখলুক ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরও তিনি অবশিষ্ট থাকবেন। অর্থাৎ যখন কিছুই ছিল না তখনো তিনি ছিলেন এবং যখন কিছুই থাকবেনা তখনো তিনি থাকবেন।

আর আল্লাহ তাআলার الظَاهِر (সবকিছুর উপরে) ও البَاطِن (অতি নিকটে) এ নাম দু’টি প্রমাণ করে যে, তিনি উর্ধ্বজগৎ এবং নিমণজগতের সকল স্থান এবং সেসব স্থানের সব কিছুকেই ঘেরাও করে আছেন।

আল্লাহর যাহের নামটি প্রমাণ করে যে, তিনি সকল মাখলুকের উপরে। আরবী ভাষায় প্রত্যেক বস্তুর উপরের অংশকে যাহের বলা হয়। সকল মাখলুক তার নীচে। তার উপরে কোন মাখলুক নেই।

কেউ কেউ যাহের অর্থ করেছেন যে, তিনি প্রকাশ্য। তাদের মতে الظهور থেকে الظاهر নামটি এসেছে। ظهور অর্থ প্রকাশিত হওয়া। সুতরাং তিনি তার নিদর্শন, দলীল-প্রমাণ এবং কার্যাবলীর মাধ্যমে মানুষের বিবেকের নিকট অত্যন্ত প্রকাশিত। আর তিনি الباطن অপ্রকাশ্য এই হিসাবে যে, দুনিয়ার অন্যান্য দৃশ্যমান জিনিসের মত তাকে দেখা যায় না।

সুতরাং এ চারটি নামের মূল অর্থই হচ্ছে আল্লাহ তাআলা সকল সৃষ্টিকে সকল দিক থেকেই ঘেরাও করে আছেন। সৃষ্টির সূচনার পূর্বেই আল্লাহ তাআলা বিদ্যমান থাকা এবং সব সৃষ্টির শেষেও অনন্তকাল তার অবশিষ্ট থাকা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম যেসব বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং সবশেষে যেসব বস্তু সৃষ্টি করবেন, তার সবই তিনি পরিবেষ্টন করে আছেন। তিনি যাহের তথা সবকিছুর উপরে হওয়া এবং বাতেন তথা সবকিছুর নিকটে হওয়ার দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, তিনি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল বস্তুকেই ঘেরাও করে আছেন।

সে হিসাবে আল্লাহ তাআলার الأول নামটি তার সর্বপ্রথম হওয়ার প্রমাণ করে। তার الآخر নামটি তার

চিরস্থায়িত্বের প্রমাণ করে। তার الظاهر নামটি প্রমাণ করে যে, তিনি সবকিছুরে উপরে এবং তিনি সর্বাধিক মহান। আর আল্লাহ তাআলার الباطن নামটি প্রমাণ করে যে, তিনি সৃষ্টির অতি নিকটে এবং তাদের সাথে।

আল্লাহ তাআলার الباطن নামটির ব্যাখ্যায় আলেমদের থেকে বিভিন্ন উক্তি পাওয়া যায়। সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ অর্থাৎ তুমি অতি নিকটে, তোমার চেয়ে অধিক নিকটে আর কিছুই নেই। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, الباطن অর্থ নিকটে। সুতরাং আল্লাহ তাআলা মাখলুকের নিকটবর্তী এবং তিনি স্বীয় ইলমের মাধ্যমে তাদেরকে বেষ্টন করে আছেন। তিনি তাদের সকল গোপন এবং অস্পষ্ট বিষয় ও অবস্থা সম্পর্কে জানেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ﴾ ‘‘আমি তোমাদের চেয়ে সে মুমূর্ষ ব্যক্তির অধিক নিকটবর্তী, কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না। (সূরা ওয়াকিয়া: ৮৫) আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ ‘‘আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি। আর তাদের মনে যেসব কুমন্ত্রণা উদিত হয় তা আমি জানি। আমি তার ঘাড়ের শাহ রগের চেয়েও অধিক নিকটে আছি’’। (সূরা কাফ: ১৬)

এ আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে যে, আমার জ্ঞান ও ক্ষমতা ভিতর এবং বাহির থেকে এমনভাবে মানুষকে পরিবেষ্টন করে আছে যে, আমার ক্ষমতা ও জ্ঞান তার তত নিকটে যত নিকটে তার ঘাড়ের শিরাও নয়। তার কথা শোনার জন্য আমাকে কোথাও থেকে আসতে হয় না। তার মনের মধ্যে উদিত কল্পনাসমূহ পর্যন্ত আমি সরাসরি জানি। অনুরূপভাবে তাকে যদি কোন সময় পাকড়াও করতে হয় তখনো আমাকে কোথাও থেকে এসে তাকে পাকড়াও করতে হয় না। সে যেখানেই থাকুক, সর্বদা আমার আয়ত্বাধীনেই আছে যখন ইচ্ছা আমি তাকে বন্দী করবো।

কেউ কেউ বলেছেন, الباطن অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলা সৃষ্টির দৃষ্টিসীমা ও ধারণার অন্তরালে এবং অপ্রকাশ্য। যারা এ কথা বলেছেন, তাদের কেউ কেউ একটু বাড়িয়ে ব্যাখ্যা করেছেন যে, আল্লাহ তা‘আলা যেহেতু অপ্রকাশ্য, তাই পৃথিবীর কোথাও তাকে খুঁজে বের করা বা তার দেখা পাওয়া যাবে না। তিনি সব গুপ্ত জিনিসের চেয়ে অধিক গুপ্ত। কারণ, ইন্দ্রীয়সমূহ দ্বারা তার সত্তাকে অনুভব ও উপলব্ধি করা তো দূরের কথা বিবেক-বুদ্ধি, চিন্তাভাবনা ও কল্পনা পর্যন্ত তার রহস্য ও বাস্তবতাকে স্পর্শ করতে পারে না।

যারা আল্লাহ তা‘আলার الباطن নামের উপরোক্ত অর্থ বর্ণনা করেছেন, তারা তার الظاهر নামের অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, যাহের অর্থ প্রকাশ্য। তারা উভয় নামের অর্থ এভাবে করেছেন যে, তিনিই প্রকাশ্য, তিনিই অপ্রকাশ্য। তিনি সব প্রকাশ্যের চেয়ে অধিক প্রকাশ্য। কারণ পৃথিবীতে যেসব জিনিস প্রকাশমান তা তারই গুণাবলী, তারই কার্যাবলী এবং তারই নূরের প্রকাশ।

কেউ কেউ বলেছেন, الباطن অর্থ হচ্ছে هو العالم بما بطن يقال بطنت الأمر اذا عرفت باطنه তিনি সকল গুপ্ত বস্তু সম্পর্কে অবগত। যেমন বলা হয়, بطنت الأمر আমি বিষয়টির গোপন অবস্থা সম্পর্কে জানতে পেরেছি। এ কথা আপনি ঠিক তখনই বলেন, যখন ঐ বিষয়ের গুপ্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে পারেন। দেখুন, শাইখ সিন্দী (রঃ)

এর টিকাসহ ইবনে মাজাহ, (৮/২১৭)

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, হাদীছে যেহেতু বলা হয়েছে الظاهر অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা সবকিছুর উপরে, তার উপরে আর কিছু নেই, তাই যাহেরের মোকাবেলায় الباطن এর অর্থ এ রকম বলা যাবে না যে, তিনি সবকিছুর নীচে, তার নীচে আর কিছুই নেই, নাউযুবিল্লাহ। সুতরাং আল্লাহ আমাদের নীচে, এটি বলা অবৈধ। কেননা কোন কিছুর নীচে হওয়া ত্রুটিপূর্ণ সিফাত বা বিশেষণ। আল্লাহ তাআলার সত্তা উপরে হওয়ার বিশেষণে বিশেষিত, নীচে হওয়ার বিশেষণে নয়। উপরে হওয়া আল্লাহর সিফাতে যাতীয়া বা সত্তাগত গুণ।

মোটকথা আল্লাহ তা'আলার উপরোক্ত চারটি নামের ব্যাখ্যায় উপরে বর্ণিত অর্থগুলোর সবগুলোই বা অধিকাংশই সঠিক। তবে ঐ নামগুলোর ব্যাখ্যায় নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছেন, তাই আমাদের বিশ্বাস করা ও মেনে নেওয়া আবশ্যক। যে অর্থ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, তার বিপরীত ছাহাবী, তাবেঈ এবং সালাফে সালেহীন থেকে কিছুই পাওয়া যায়নি। সুতরাং তা গ্রহণ করাই অধিক নিরাপদ।

[3]. আয়াতুল কুরসীতেও আল্লাহ তা'আলার বেশ কিছু অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলী এক সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

"তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি চিরজীবন্ত ও সবকিছুর ধারক। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাকে স্পর্শ করতে পারে না। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সব তারই। এমন কে আছে যে তার অনুমতি ছাড়া তার নিকট সুপারিশ করতে পারে? তাদের সম্মুখের ও পশ্চাতের সবই তিনি অবগত আছেন। তার জ্ঞান থেকে কোন কিছুই তারা পরিবেষ্টন করতে পারে না। কিন্তু তিনি যে জিনিসের জ্ঞান মানুষকে দিতে চান, সেটুকুর কথা ভিন্ন। তার কুরসী আসমান ও যমীন পরিব্যপ্ত হয়ে আছে। আর আসমান ও যমীনকে ধারণ করা তার জন্য মোটেই কঠিন নয়। আর তিনি সমুন্নত, মহান"। (সূরা আল বাকারা ২:২৫৫)

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=8869

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন